145

আজকের কাগজ

তারিখ ... 18 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... ৬

ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাস

কে এম সোবহান

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তথা দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে শিক্ষার পীঠস্থানগুলো সন্ত্রাসের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সন্ত্রাসের কারণ আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছানোর চেষ্টা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রথম সোপান হিসাবে ধরা হয় ছাত্রাবাস ও ইউনিয়ন দখল। এই ক্ষমতা কিসের এবং কোথায়, তার উত্তর সহজ। ছাত্রাবাসগুলোতে প্রভাব বিস্তার করা হোক, যেখানে কেবল নিজ দলীয়রাই থাকবে। লক্ষ্য ইউনিয়ন নির্বাচনে জয়লাভ এবং ইউনিয়নের ক্ষমতা দখল। কিভাবে সে জয় আসবে, কিভাবে ক্ষমতা দখলে আসবে সে প্রশ্ন অবান্তর। মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো ক্ষমতা দখল। সেই ক্ষমতা কলেজগুলো থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে সরকার পক্ষের শক্তি বা বিপক্ষের শক্তির ঘাঁটি। অর্থাৎ জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতা, বা প্রভাব বিস্তারের অন্যতম ঘাঁটি হবে বিদ্যাপীঠগুলো। রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তারের জন্য স্বীকৃত গণতান্ত্রিক প্রথার উপর আর আস্থা নেই। শক্তির উৎস হবে বন্দুকের নল। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে অস্ত্রের উপর আস্থাশীল হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দল। ভোটের উপর আস্থা নেই। নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে প্রয়োজন হবে অর্থশালী ও অস্ত্রধারী মাস্তানদের। বিত্তশালীরা যাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি আছে তারা মাস্তানী করে, অর্থ খরচ করে আর এদেরই পক্ষপুটে থাকে অস্ত্রধারী মাস্তানরা। একে অপরকে শক্তি যোগায়। একে অপরকে সাহায্য করে। রাজনৈতিক চালচিত্রের পরিবর্তন যখন হয় তখন কিছুদিন মাথা নীচু করে থাকে তারপর আবার রাজনীতির অঙ্গনে নির্ভীক পদচারণা করে এই সব মাস্তান।

বিদ্যাপীঠগুলোতে সন্ত্রাসের ফল অনুভূত হচ্ছে জাতীয় জীবনে। যে সব ছাত্র পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে তাদের উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যস্থল বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নয়। তারা চেষ্টা করে জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেতে। সেখানে যেতে হলে ছাত্র হিসাবে পড়াশুনা করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তা শতকরা নব্বই ভাগ অভিভাবকের নেই। তবুও তারা চলে যাচ্ছে অনেক ফন্দী ফিকির করে। ঐ সব দেশে গিয়ে চাকরি করে বা নানা ধরনের কাজ করে পড়া চালাবার চেষ্টা করে প্রথম দু'এক বছর কিন্তু বিষয়টি সহজ নয়। কাজেই পড়া বাদ দিয়ে একদিন সার্বক্ষণিক কাজ নেয়। আপাত সাফল্য আসে। অর্থ আসে সেই সঙ্গে। আসে পারিবারিক স্বাচ্ছল্য। অভিভাবকরা ভুলে যান যে তাঁদের প্রতিপাল্যরা শিক্ষিত নয়। সাফল্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায় অর্থোপার্জনের ক্ষমতা।

আর দেশে যারা থেকে যায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় অনেক আশা নিয়ে। আশা এইটুকু যে সন্ত্রাসের সমাপ্তি হবে, তারা পড়াশুনা করতে পারবে, নিয়মিত সময়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। তারপর জীবিকার জন্য প্রতিযোগিতা করবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হয় না। চার বছরের কোর্স সাত বছরেও শেষ হয় না, শেষ হয়ে যায় ধৈর্যের সীমা এবং এবং অভিভাবকদের অপেক্ষা করে থাকার সময়। সাত বছরেও পড়া হয় না, ক্লাস হয় না, লাইব্রেরীতে পড়াশুনা হয় না। পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য তখন হ্রস্ব পথের সন্ধানে বের হয়। এরা যখন পাস করে আসে তখন সরকারী চাকরিতে ঢোকার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসে। প্রশ্ন যদি অপরিচিত হয় তাহলে হলে মাস্তানী করে। নকল করে, আর যাদের সুযোগ আছে তারা আগেভাগে প্রশ্নপত্র জানার চেষ্টা করে এবং পরীক্ষায় সাফল্যের একেবারে গোড়াতে আঘাত করে। প্রশ্ন পূর্ব থেকে জেনে বা মাস্তানী করে বা কিছুই না করে পরীক্ষায় পাস করে। প্রথম, দ্বিতীয় বা চাকরি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট উঁচুতে স্থান করে নেয়। কেননা যারা পরীক্ষা দেবে তাদের মধ্য থেকেই সফল ছাত্রদের সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরীক্ষক এবং পরিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি সমপর্যায়ের। সেখানেও জ্ঞানের যাচাই হয় না। এঁরা যখন সরকারী চাকরিতে ঢোকেন তখন সরকারী কাজকর্মে তার প্রতিফলন ঘটে, যার ফল ভোগ করতে হয় জনসাধারণকে। যারা ব্যবসাবাণিজ্যে যায় সেখানেও ঐ একই চিত্র। হ্রস্ব পথের পথিকরাই হবে দেশের আমলা, কেরানী, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, রাজনীতিক ও অন্যান্য পেশাজীবী ও কর্মজীবী। এরা বর্তমানে সংখ্যালঘিষ্ঠ কিন্তু কালক্রমে এরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আগামীতে দেশের, মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক হবে এরাই। এই অবস্থার পরিবর্তন যদি কাম্য হয়, তাহলে ফিরে তাকাতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিদ্যাপীঠগুলোর দিকে।

যে বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি, সেই বৃত্তের বাইরে আসতে হবে। সন্ত্রাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা। অভিভাবক, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তারা পরোক্ষভাবে জড়িত। কেননা তাঁদের প্রতিপাল্য ও ছাত্ররা শিকার হচ্ছে এই সন্ত্রাসের অন্য আর একদল প্রতিপাল্য ও ছাত্রদের দ্বারা। অনেকে সন্দেহ করেন যে ছাত্র সংগঠনগুলো যতখানি না জড়িত তার চেয়ে বেশী জড়িত ছাত্রনামধারী বিভিন্ন গুপ্ত সংস্থার এজেন্টরা। এরা পেশাদার সন্ত্রাসী। এইসব সন্ত্রাসীরা কোন বিশেষ দলভুক্ত নয়। তারা নেপথ্যের-চক্রান্তকারীদের আজ্ঞাবহ। এইসব চক্রান্তকারী-ষড়যন্ত্রকারী কারা, তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারী কর্মকর্তাদের। এইসব চক্রান্তকারী বা ষড়যন্ত্রকারীদের মুখ ও মুখোশ আছে, তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এরা আশ্রয় দেয়, প্রশ্রয় দেয় সন্ত্রাসীদের।

গত কয়েকদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে 'অস্ত্রবোঝাই মাইক্রোবাস যাতায়াত করছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। এইসব অস্ত্র আসছে বাইরে থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢোকার সব ক'টি রাস্তার মুখে ব্যারিকেড আছে, পুলিশ আছে, তারা বাধা দেয় গাড়ী ঢুকতে গেলে। কিন্তু এদের চোখে ধুলো দিয়ে বা চোখের উপর দিয়েই এইসব অস্ত্র আসছে। এইসব অস্ত্রের মহড়া চলছে। শত শত রাউণ্ড গুলি চলছে এক হল হতে আর এক হলের দিকে। অস্ত্রধারীরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্লাবটি অস্ত্রের মুখে দখল করছে। হল দখল করছে। এইসব রোমহর্ষক খবর আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শরৎকালীন অবকাশ। ঠিক এই সময়েই অস্ত্রধারীরা বিচরণ করছে, অস্ত্র আমদানী করছে। সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয় খুললেই শক্তি পরীক্ষা হবে দলগুলোর মধ্যে। অবশ্য খণ্ড যুদ্ধ এখন চলছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ হয়ে গেল সন্ত্রাসের জন্য। কবি নজরুল কলেজে গুলিগোলা হয়েছে সেখানে ইউনিয়ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। মুন্সীগঞ্জেও কয়েকদিন আগে একটি ছাত্র গুলির আঘাতে নিহত হয়েছে। ঢাকায় একটি স্কুলছাত্র ছুরিকাহত হয়েছে।

শরৎকালীন অবকাশ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পরীক্ষা আরম্ভ হবার কথা। পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষা চলছে। যাতে যথাসময়ে তাদের পরীক্ষা হতে পারে, সেই জন্য ছাত্ররা মিলাদ দিয়েছে। তাদের সামনে এখন বিরাট প্রশ্ন পরীক্ষা হবে কি? পরীক্ষা দিতে গিয়ে তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে কি?

সন্ত্রাস বন্ধ করার কথা ছাত্র সংগঠনগুলো বলছে, শিক্ষকরা বলছেন, রাজনৈতিক দলগুলোও বলছে। অর্থাৎ সকলেই চাইছেন যাতে সন্ত্রাস বন্ধ হয়, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিদ্যাপীঠে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসে। সকলেরই ঐ একই কামনা কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ত্রাস থামছে না। শান্তি ফিরে আসছে না। সন্ত্রাস বন্ধ হওয়া দূরের কথা আগামীতে আরও বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনগুলো জড়িত এই সন্ত্রাসের সঙ্গে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলছেন সন্ত্রাস বন্ধের কথা কিন্তু তার কোন ফল দেখা যাচ্ছে না। নেতৃবৃন্দদের নির্দেশের বাইরে কি তাহলে তাদের ছাত্র সংগঠনগুলো, না কি তাঁরা এ বিষয়ে আন্তারিক নন। তাঁদের আন্তরিকতাকে যদি প্রশ্ন করতে হয় তাহলে রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা অবশ্যই অশুভ। তাঁদের আন্তরিকতাকে প্রশ্ন করলে জাতীয় রাজনীতির গতি প্রকৃতির উপর আস্থা হারাতে হয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশে তা অসম্ভব চিন্তা। গণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন সকল গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দল। সন্ত্রাস যদি দমন করা সম্ভব না হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর পড়তে বাধ্য। অবস্থাদৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব তাঁদের ছাত্র সংগঠনের উপর খুবই শিথিল। তা যদি হয় তাহলে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে দুটি ভাগ আছে বলে ধরে নিতে হবে- একটি হচ্ছে রাজনৈতিক, অপরটি সন্ত্রাসকারী। রাজনৈতিক অংশের উপর রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও সন্ত্রাসকারীরা পরিচালিত হয় অন্য কারও নির্দেশে। কাদের নির্দেশে তারা পরিচালিত হয় তা উদ্‌ঘাটনের উপরই নির্ভর করবে রাজনৈতিক দলগুলোর সাফল্য। সন্ত্রাসকারীরা যদি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কাজ করে তাহলে প্রথমত ছাত্ররা এবং পরে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি রাজনীতি বিমুখ হয়ে পড়বে যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে দারুণ ক্ষতিকারক।

সবশেষে পর্যালোচনা করতে হয় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে। দেশে আইন-শৃংখলা রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিদ্যাপীঠগুলো দেশের বাইরে বা তাদের আওতার বাইরে নয়। আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা খুব সন্তোষজনক নয়। রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করতে তাদের যতখানি তৎপর দেখা যায়, ততখানি তৎপর দেখা যায় না আইন-শৃংখলা রক্ষা করার ব্যাপারে। কয়েক সপ্তাহ আগে যখন একদিনের হরতাল হলো তখন তাদের সেই এরশাদী আমলের মতই আচরণ করতে দেখা গেছে হরতাল সমর্থনকারীদের সঙ্গে। তাদের নাকের ডগার উপর দিয়ে অস্ত্রপূর্ণ মাইক্রবাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছে। তারা নির্বিকার, তাদের এই আচরণের জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তারা যদি নিরুদ্বেগ থাকে এসব ব্যাপারে, তাহলে জনগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে তাদের স্বার্থ আছে সন্ত্রাসীদের অপবাধমূলক এবং গণবিরোধী এই কার্যকলাপে। যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হবে আইনের শাসন বজায় রাখা এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া। যদি আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাই তাদের দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করে বা ব্যর্থ হয়, তাহলে সরকারের দায়িত্ব হবে সমস্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করা নৈর্ব্যক্তিকভাবে। সরকার যদি আইন-শৃংখলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া সমগ্র সমাজের উপর পড়বে। সমাজ অস্ত্রের সামনে বিপন্ন হবে। রাজনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হয় অর্থ ও অস্ত্রধারী মাস্তানরা তাহলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিপন্ন হবে এবং যে হতাশা জনগণের মনকে আচ্ছন্ন করেছে তারই জয় হবে, পরাজিত হবে সুস্থ রাজনীতি।

কে এম সোবহান : লেখক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।